পবিত্র ঈদ-ই- মিলাদুন্নবী (সাঃ) – ২০২৪

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী থেকে মানবাধিকার ও নারীর মর্যাদা শীর্ষক আলোচনাঃ

আলোচকঃ অধ্যাপক কোর আয়েশা বেগম

বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা

বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম.....

নীরস শুষ্কতায় ভরা এক মরুভূমির বুকে করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তার অফুরন্ত দয়া ও ভালবাসায় রহমতুল্লিল আলামীন হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সাঃ) - আলাইহে অসাল্লামকে অবতীর্ন করলেন। চান্দ্রমাস রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ, সোমবার। শূল্কাদ্বাদশীর চাঁদ কেবল অস্ত গিয়েছে। তবুও আকাশের তারায় তারায় তারই আলোর রেশ কী যেন এক গভীর রহস্যের বার্তা নিয়ে কানাকানি করছিল। মরুর পৃথিবীতে ঘরে ঘরে নিকশ অন্ধকারে নিদ্রামগ্নতা। এমন সময় সুখস্বপ্নে বিভোর পূর্ন গর্ভবতী মুহম্মদ জননী আমিনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেই ঘুম ভাঙ্গা ভোরে তাঁর কোলে ভূমিষ্ঠ হলেন ভোরের আজানের মত শুভ্র এক পবিত্র ও মহান মানবশিশু। আকাশ থেকে যেন ফেরেশতারা বিশ্বজাহানের উদ্দেশ্যে ঘুম ভাঙ্গানিয়া আজান দিল- আসসালাত খায়রুম মিনান্নাওম- জাগো, জাগো-------।

এখন থেকে প্রায় ১৪০০ বছরেরও আগে বিশ্বমানবতা তথা বিশ্বসমাজের মুক্তির দূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে শান্তির বার্তা আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ আসমানী পয়গাম মহাগ্রন্থ **আল-কুরআন** দিয়ে পাঠিয়েছেন।

ইসলামে মানবাধিকার

মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যই আল্লাহ তায়ালা নবী–রাসুল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাজিল করেছেন, শরিয়তের বিধান দিয়েছেন। ইসলামি শরিয়তের বিধানেও মানবাধিকার-সংক্রান্ত পঞ্চধারা প্রধান বিবেচ্যরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা জীবন রক্ষা, সম্পদ রক্ষা, বংশ রক্ষা, জ্ঞান রক্ষা ও ধর্ম রক্ষা। মূলত মানবতার সুরক্ষা বা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ)

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে কালজয়ী চিরন্তন আদর্শ হিসেবে একমাত্র ইসলামই সব যুগে মানবসমাজে মানুষের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। দুনিয়াবাসীর কাছে সর্বপ্রথম মানবাধিকারের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ঘোষণা করেন বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)। ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় নবদীক্ষিত মুসলমানদের জীবনে যে অমানবিক অত্যাচার ও নিপীড়ন নেমে এসেছিল, তাতে মানবাধিকার চরমভাবে লঙিঘত হয়েছিল।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত প্রাপ্তির অনেক আগ থেকে তাঁর উত্তম চরিত্র ও মানবিক গুণাবলীর জন্যে **‘আল-আমীন’ বা ‘পরম বিশ্বস্ত’** খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যখন তিনি গোটা আরব

জাহানের নেতা হয়ে উঠলেন তখন তিনি কী সমাজ জীবনে, কী পারিবারিক জীবনে, কী রাষ্ট্রীয় তথা নাগরিক জীবনে, কী বিশ্ব নাগরিক হিসাবে, সর্বক্ষেত্রে মানুষের মূল্য-মর্যাদা ও মানবাধিকারের যে সার্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল ও অভূতপূর্ব। কুয়েত ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে 'ইসলামে মানবাধিকার' বিষয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী প্রবন্ধে জনাব আইকে রুহি বলেন, মানবাধিকারই হচ্ছে ইসলামী আইনের মূল ভিত্তি। প্রবন্ধে জনাব আইকে রুহি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্বের ভাষণকে মানবাধিকারের সর্বপ্রথম ঘোষণা হিসাবে উল্লেখ করেন।

আরবের কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মানবতার মূর্ত প্রতীক নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করেন। এত অত্যাচার সত্ত্বেও ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) সবাইকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে আল্লাহর প্রিয় হাবিব (সাঃ) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগৎবাসীর সামনে উপস্থাপন করে রেখেছেন-

১। সব মানুষের সম-অধিকার

ইসলামের শিক্ষা হলো- সব মানুষ একই উপাদানে তৈরি, সবাই এক আল্লাহর বান্দা। সব মানুষ একই পিতা–মাতার সন্তান; সব মানুষ একই রক্তে-মাংসে গড়া; তাই সাদা-কালোয় কোনো প্রভেদ নেই। সব মানুষ আখেরি নবী হজরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মত। কবরে ও হাশরে সবাইকে একই প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং, সব মানুষের মানবাধিকার সমান। রাসূল (সাঃ) তার বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন-সাবধান! অনারবের ওপর আরবের কিংবা আরবের ওপর অনারবের, কালো মানুষের ওপর লাল মানুষের কিংবা লাল মানুষের ওপর কালো মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। যার মধ্যে আল্লাহভীতি আছে সে-ই শ্রেষ্ঠ।

উল্লেখ্য যে- 'রাসূল (সাঃ) - এর সামনে দিয়ে একবার এক ইহুদির লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর এতে তিনি ওই লাশের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন, তখন হজরত জাবের (রা:) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি তো ইহুদির লাশ! তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, সে কি মানুষ নয়?' (বুখারি)।

২। ইসলামে মানুষের নিরাপত্তা লাভের অধিকার

ইসলাম মানবজীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। মহান স্রষ্টা প্রাণ দানের মাধ্যমে মানবজীবনকে যেমন সম্মানিত করেছেন, তেমনি জীবন হরণকে করেছেন নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা কোরো না।' (সুরা বনি ইসরাইল: ৩৩) আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 'নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল।' (সুরা মায়েদা: ৩২)

যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাদের শাস্তি প্রদান করবেন।' (মুসলিম-২৬১৩) মুহাম্মাদ (সাঃ) আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং আত্মহত্যাকারী তার নিজের জীবন নিজেই শেষ করে দেওয়ার শাস্তি হিসেবে আখেরাতে আত্মহত্যার অনুরূপ পন্থায় শাস্তিভোগ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩। শিশুদের জীবনের অধিকার

জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগে, বিশেষত আরবদের নবজাতক বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের জন্মলাভের পরপরই দারিদ্রের ভয়ে হত্যা বা জীবন্ত প্রোথিত করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আল্লাহ তা' আলা বলেন- অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কোর না। (সুরা বনী ইস্রাইলঃ ৩১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামী সমাজে শিশু হত্যার এ জঘন্য প্রবণতাকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনের প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শিশুদের জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা হয়। নারী ও শিশু, বিশেষত কন্যাশিশু এবং অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মানবাধিকার সুরক্ষা করা সচেতন ও সামর্থ্যবান সব নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব এবং ইমানি কর্তব্য। জন্মের পর শিশুর অন্যতম অধিকার হলো তার দুধপানের ব্যবস্থা করা, তার যত্ন নেওয়া, তাকে সব ধরনের রোগবালাই থেকে মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।' (সুরা: বাকারা, আয়াত: ২৩৩)

৪। জীবনোপকরণ ও সম্পদের অধিকার

ইসলাম জীবিকার তাগিদে, জীবন রক্ষার প্রয়োজনে মানুষকে স্থানান্তরিত হওয়ার অধিকার দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কোরো এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার গ্রহণ কোর।' (সুরা : মুলক, আয়াত : ১৫)। আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'আল্লাহ তায়ালা (সৃষ্টিতে ও গুণাবলিতে) তোমাদের একের ওপর অন্যের যে প্রাধান্য দিয়েছেন, তা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব জাহির কোরো না। প্রত্যেক পুরুষ তা-ই পাবে, যা সে অর্জন করে এবং প্রত্যেক নারী তা-ই পাবে, যা সে অর্জন করে, আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে অবগত আছেন।' (সুরা: ৪ নিসা, আয়াত: ৩২)কেউ কারও সম্পদ যেন অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ না করে, সে জন্য বিধান দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষনির্বিশেষে সব অপরাধীর সমান শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। ইসলাম বৈধ উপার্জনের অধিকার, তার মালিকানা রক্ষা, হস্তান্তর, দান এবং তা ভোগ করার অধিকার দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে, 'তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না।' (সুরা বাকারা: ১২৮)

৫। সম্ভ্রম রক্ষার অধিকার

মানুষের মর্যাদাহানি, হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য নিন্দা, কুৎসা রটানো, বিদ্রূপ ও উপহাস করা, নাম ও উপাধি বিকৃত করাকে নিষিদ্ধ করে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'তোমাদের কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যেন বিদ্রূপ না করে।' (সুরা হুজুরাত : ১১) এ প্রসঙ্গে রাসুল (সাঃ) বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের ইজ্জত-সম্মান তোমাদের কাছে পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস।' (সহিহ বুখারি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৩২)

৬। জ্ঞানের সুরক্ষা ও শিক্ষার অধিকার

ইসলাম নারী-পুরুষ সবার জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: 'ইলম বা শিক্ষা গ্রহণ করা সব নারী ও পুরুষের ওপর ফরজ কর্তব্য।' (সুনানে ইবনে মাজাহ) । তিনি বলেছেন- "তোমরা দুলনা হতে কবর পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন কর।

৭। বংশ, পবিত্রতা ও সম্মান সুরক্ষার অধিকার

সভ্য মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য এবং সুসভ্য সমাজ ও সংস্কৃত জাতির পূর্বশর্ত হলো আত্মীয়তার বন্ধন, বৈবাহিক সম্পর্ক ও দাম্পত্য জীবন। ইসলামে বংশ মর্যাদা, শ্রেণিবিভেদ, জাতিগত বিভেদ ও বর্ণবিভেদ থেকে সতর্ক করেছে। মানুষের সম্মান কোনো বর্ণ-গ্রোত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে না। বরং আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা বা তাকওয়া নির্ধারণ করবে ব্যক্তির মর্যাদা। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে-'আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান হলো যারা তাকে ভয় করে।' (সূরা-আল হুজরাত) ।

৮। বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার

মুহাম্মাদ (সাঃ) আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন দর্শনে বিবাহ সমভাবে একটি অধিকার ও ধর্মীয় দায়িত্ব। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আর আমি নারীদের বিবাহ করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহ্ থেকে বিমুখ হল সে আমার আদর্শভুক্ত নয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত বিবাহ ব্যবস্থা এমন একটি সামাজিক চুক্তি যাতে স্বামী-স্ত্রীই হল পরিবারের মূল ভিত্তি এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের উপরই প্রাথমিকভাবে পারিবারিক জীবনের শান্তি ও সুখ নির্ভর করে,তাই কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে: 'তাঁরা (স্ত্রীগণ) হবে তোমাদের (স্বামীদের) ভূষণ আর তোমরা (স্বামীগণ) তাদের (স্ত্রীদের) ভূষণ।' এখানেও নারী-পুরুষ উভয়ের যথাযথ ভূমিকা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে; পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের সুযোগ এবং প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের এখতিয়ারও রয়েছে। (সুরা: ২ বাকারা, আয়াত: ২৩০)।

৯। ধর্মকর্মে সম-অধিকার

রাসুল (সাঃ) বলেছেন- 'অমুসলিমদের জীবন আমাদের জীবনের মতোই এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতোই।' রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন, 'সাবধান! যদি কেউ কোনো মুআহিদের (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক) প্রতি জুলুম কর বা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা সাধ্যাতিরিক্ত কোনো কাজ তার ওপর চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার থেকে কোনো মালামাল নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে থাকব।' (আবু দাউদ, মিশকাত পৃ. ৩৫৪) মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায়গুলো সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং তারা একটি জাতি গঠন করবে। তিনি আরও বলেন- পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে। মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা বিনা দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ইহুদিদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১০। ইসলাম ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন। এই স্বাধীনতা আল্লাহ কর্তৃক প্রদেয় নিশ্চয়তা। যেকোনো ধরনের জোরজবরদস্তি ইসলামী রাষ্ট্রে সম্ভব নয়। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতা দিয়েছে; যতক্ষণ না তার স্বাধীনতা অন্যের তথা সমাজের স্বাধীনতা ও কল্যাণকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। ইসলামী নীতি অনুযায়ী কোনো উপযুক্ত আদালতে আইনানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না। কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ—'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তা করবে।' (সুরা নিসা: ৫৮)

১১। সংখ্যালঘুদের অধিকার

মদিনা সনদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মদিনায় বসবাসের অধিকার দিয়েছিল। এমনকি তাদের একটি অংশ বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও বাকি অংশের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়নি। অমুসলিমদের ধর্মীয় উপাস্যদের নিন্দাবাদ ও গালমন্দকে কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এভাবে—'আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা যারা করে, তাদের উপাস্যদের তোমরা গালাগাল কোরো না।' (সুরা আনআম: ১০৮। মূলত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মদিনা রিপাবলিকে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত ইসলামী রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান **Charter of Madina**-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার অধিকার ও মর্যাদার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

১২। সম্পত্তির মালিকানার অধিকার

রাসূল (সাঃ) প্রবর্তিত ইসলামী সম্পত্তির অধিকার এতটাই নিয়ন্ত্রিত যে, ব্যক্তি এখানে সম্পদ উপর্জনের লাগামহীন স্বাধীনতা লাভ করে না। ইসলামী সমাজের সকল সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত (trustee) হিসাবে এর অর্জন, ভোগ ও বণ্টনের অধিকার লাভ করে। আল-কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,' তাদের সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।' (সুরা যারিয়াতঃ ১৯) দান, খয়রাত, সদকা, যাকাত, ফিতরা প্রভৃতির মাধ্যমে বর্ধিত সম্পদের বিলি-বন্টন করে ইসলামে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থার কথাই রাসূল (সাঃ) তাঁর জীবনে কার্যকরভাবে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১৩। স্বাধীনভাবে চলাচল, বসবাস, রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার

মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার প্রদান করে। তাঁর রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে একটি 'বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা' ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্রদর্শন অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর রাজত্বস্বরূপ- যা তিনি সকল মানুষের চলাচল ও বসবাসের জন্যে অবারিত করে দিয়েছেন।

১৪। নিপীড়ন-নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক আচরণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো ব্যক্তিকে শারীরিক-মানসিক শাস্তিদান বা তাকে কষ্ট দেওয়াকে রাসূল (সাঃ) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার কথা বা হাত (কাজের নিপীড়ন) থেকে মুসলিমগণ নিরাপদে থাকেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো অপরাধের জন্য অন্যকে দণ্ড দেওয়ার রেওয়াজও চিরতরে রহিত করে দেন। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেন, 'জেনে রাখ, কারো অপরাধের জন্য তারা নিজেকেই দণ্ড বহন করতে হবে। সুতরাং পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।'

১৫। অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে ন্যায়বিচার লাভের অধিকার

মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক-সামাজিক পেশাগত মর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার লাভ করে। মূলত ন্যায়বিচার ধারণা কুরআনে প্রায় ষাটটি আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে: 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।' ইসলাম সব মানুষের প্রতি সুবিচারের নির্দেশ দিয়ে বলে, 'হে মুমিনরা! আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কোরো এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটতর।' (সুরা: মায়িদা, আয়াত: ৮)

১৬। শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায়

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন যে: 'আমি তোমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। 'কুরআনের এ বাণী পরিপূর্ণভাবে সত্যে পরিণত করেছিলেন রাসূল (সাঃ)। শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অনন্য সাধারণ উদাহরণ রেখে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা আজো অদ্বিতীয় এবং সর্বজনস্বীকৃত অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পরিগণিত। কেননা তিনি কেবল মুসলিমদের আদর্শ ছিলেন না, ছিলেন গোটা মানব জাতির আদর্শ।

১৭। দয়া, ক্ষমা ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায়

মহানবী (সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, ক্ষমাশীল ও কোমল। এই মহামানব স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন: 'যে মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে দয়া করেন না। 'অন্য একটি হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন: 'যমীনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করা, তাহলে উর্ধ্বালোকে যিনি আছেন তিনি তোমার প্রতি সদয় হবেন।'

অন্যদিকে শ্রমিক ও কর্মচারী দের প্রতি সদয় ব্যবহার করা, পোশাক-আশাক দেওয়া ও বিশ্রাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেও তাগিদ দিয়েছেন। বস্তুত বিশ্বনবী (সাঃ) শ্রমিকদের সব প্রকার বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন আর গ্লানির অবসান করে এমন সব শ্রমনীতির প্রবর্তন করে গেছেন যার সিকি শতাংশও জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আই.এল.ও) বিগত ১২০ বছর ধরে মে দিবস উদযাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি।

তাঁর এই গুণাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মুগ্ধ বিখ্যাত দার্শনিক, সাহিত্যিক জর্জ বার্ণাড শ' তাই বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি, "If all the world was united under one leader, Mohammad would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness."

মানবাধিকারকে সার্বজনীনতা, শাশ্বত আর চিরন্তন রূপ দিয়েছে আল-কুরআন এবং আল-কুরআনের পথ ধরে **মদীনা সনদ, বিদায় হজ্জের ভাষণ, নবীজীর সুন্নাহ ও হাদীস**। সুতরাং মানবাধিকার আইনের প্রথম এবং একমাত্র পূর্ণাঙ্গ রূপদাতা মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষে তাঁর পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ)

ইসলাম নারী অধিকারের ধারণা উপস্থাপন করেছে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। নারী শব্দটি উচ্চারিত হলেই মানসপটে ভেসে আসে সমাজের এক অবহেলিত গোষ্ঠীর করুণ চিত্র, যারা যুগ যুগ ধরে হয়েছে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত। পেছনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় হত্যাকারী পুরুষের বদলে তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। গ্রিক সভ্যতায় তাদের পৌরাণিক গল্পের নারী চরিত্র প্যান্ডোরাকে সমাজের সব দুঃখ-কষ্টের উৎস মনে করা হতো। আবার রোমানরাও মন চাইলেই নারীদের হত্যা করে ফেলত। মিসরীয় সভ্যতায় নারী ছিল শয়তানের প্রতীক। ভারতবর্ষের সতীদাহ প্রথা আর আরবে কন্যাশিশুদের জীবন্ত প্রোথিত করা তো ছিল অতি প্রচলিত সামাজিক রীতি। যুগের পর যুগ নারী কেবল ভোগ্যপণ্যের মতো জীবনযাপন করেছে; কোনো সমাজই তাকে তার প্রাপ্য সম্মান বুঝিয়ে দেয়নি, এমনকি পশ্চিমা বিশ্বেও।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি। নারী মুক্তির প্রবক্তা হিসাবে আমরা হয়ত কেট মিলে (Kate Millet), জার্মেন গ্রীয়ার (Germaine Greer) বা অ্যানী নূরাকীন (Anee Nurakin) প্রমুখের নাম জানি; এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ করা হয় মেরী উলস্টন, অ্যানী বেসামন্ত, মার্গারেট সাঙ্গাঁর, সুলতানা রাজিয়া, বেগম সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মহিলাদের সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর অধিকার ও মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে সংসার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ হিসাবে যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতি দেন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অধিকার পরিপূর্ণ আকারে যে ব্যক্তি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, সত্যিকার অর্থে যিনি নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির প্রবক্তা, তিনি হচ্ছেন 'একজন পুরুষ' এবং তিনি আর কেউ নন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মহানবীর ওফাতের সময় সমবেত মুসলমানদের যে সব ওসিয়ত করেছিলেন, তার মধ্যে একটি উপদেশ ছিল এরকম- আমি তোমাদের এই শেষ ওসিয়ত করছি যে, নারীর সঙ্গে যেন সর্বদা উত্তম আচরণ করা হয়। (মুসলিম) । বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ তাআলার ওহী মুতাবিক নারীজাতির মর্যাদা রক্ষায় অক্ষুণ্ন ছিলেন-

১। মায়ের মর্যাদায় নারী

মহান আল্লাহ নারীকে মায়ের মর্যাদা দিয়েছেন। শৈশবেই মা আমিনা কে হারিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। দুধ মা হালিমাকে তিনি মায়ের মতোই শ্রদ্ধা, সম্মান করেছেন, ভালোবেসেছেন। নিজের গায়ের চাদর খুলে তাঁকে বসতে দিতেন। নীরবে সাহায্য করতেন এবং উপঢৌকন পাঠাতেন। গর্ভধারীণী যে মা ছিলেন অবজ্ঞায় উপেক্ষিত, অবহেলার শিকার সেই মায়ের জন্যেই প্রিয় নবীজি (সাঃ) বলেছেন, 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত' (মুসলিম) এ কথা দিয়ে তিনি নারী জাতির মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দিলেন এবং নারীজাতিকে সর্বত্তম মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যাক্তি রাসুল (সাঃ) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা অধিকারী ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বলেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তারপরও তোমার মা। সে বলল এরপর কে, তিনি বললেন এরপর তোমার পিতা। (মুসলিম হাদিসঃ ৬৩৯৪)

ওয়াইস কুরুনি (রহঃ) মহানবী (সাঃ)- এর যুগের লোক ছিলেন। মায়ের সেবায় ব্যস্ত থাকায় তাঁকে নবীজি মদিনায় আসতে বারণ করেন। ফলে সাহাবি হওয়ার অনন্য মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তিনি মহানবী (সাঃ)- এর আদেশ মোতাবেক মায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ জারি করেছেন যে তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ করো।' (সুরা: বনি ইসরাঈল, আয়াত: ২৩) । মাতা অমুসলিম হলেও তার সাথে উত্তম আচরন করবে। (তিরমিযী)

২। স্ত্রীর প্রতি সম্মান

ইসলাম নারীকে রানির মর্যাদা দিয়েছে। স্ত্রীর প্রতি সদাচারণের ইঙ্গিত দিয়ে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা তাদের (নারির) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো এবং উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও।'(সুরা নিসাঃ ১৯) পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারি, হাদিসঃ ৫১৮৮)

আর হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, হজরত হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া (রাঃ) তার পিতা মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহর রাসুল! স্বামীর ওপর স্ত্রীর কি কি অধিকার রয়েছে? তিনি (সাঃ) বললেন, তার অধিকার হল যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যেমানের কাপড় পরবে তাকেও সে মানের কাপড় পরাবে। তার মুখে আঘাত করবে না। অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করবে না' (আবু দাউদ) মহানবী (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।' (তিরমিজি) তবে নারীর প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। কারণ, সাধারণ আরবদের মধ্যে নারী নির্যাতনের রেওয়াজ ছিল। মহানবী (সাঃ) এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, 'নারীরা আল্লাহ তাআলার দাসী, তোমাদের নয়। তাদের কখনোই মারধর করবে না।' (আবু দাউদ) । হাদিসে আরও উল্লেখ রয়েছে, 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না, কিংবা তাকে মারধর করে, তার সম্পর্কে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে, সে আল্লাহর দৃষ্টিতে সৎ বলে বিবেচিত হবে না।' (আবু দাউদ)

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ) এর জীবনে রয়েছে অতুলনীয় আদর্শ। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিলো আনন্দে পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটাতেন, বিনোদন করতেন। যা সব নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের জন্য আদর্শ স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো স্ত্রীদের তিরস্কার করতেন না, কোনো বিষয়ে কটাক্ষ করে কথা বলতেন না। তিনি হৃদয় উজাড় করে মায়া ও ভালোবাসা দিয়ে স্ত্রীদের সাথে বসে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা করতেন ও বিভিন্ন কাহিনী শোনাতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'তিনি আমাদের সাথে এমনভাবে হাসতেন, কথা বলতেন, বসতেন আমাদের মনেই হতো না যে, তিনি একজন মহান রাসুল'। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন বাইরে থেকে ঘরে ফিরতেন তখন অত্যন্ত খুশি মনে দরদ মাখা কণ্ঠে সালাম দিতেন, কখনোই কোনো ব্যাপারে স্ত্রীদের দোষ ধরতেন না।

৩। মেয়ে হিসাবে ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইমাম শাফেয়ি (রহঃ) বলেন, সন্তানরা আল্লাহর নিয়ামত। আর মেয়েসন্তানরা পুন্য। মহান আল্লাহ নিয়ামতের হিসাব নেন, আর পুন্যের প্রতিদান দেন। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যাক্তিকে কন্যাসন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে, সেই কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড় (প্রতিবন্ধক) হবে। '(তিরমিজি, হাদিসঃ ১৯১৩)

কন্যাসন্তানের গুরুত্ব বোঝাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সেই ব্যক্তি যদি তার কন্যাসন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।' (আবু দাউদ, তিরমিজি)

অন্য হাদিসে বলেন, 'যার কন্যাসন্তান আছে, সে যদি তাকে (শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে) অবজ্ঞা ও অবহেলা না করে এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (মুসনাদে আহমদ)

৪। বোনকে ইসলাম যে সম্মান দিয়েছে

রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মাঝে ভাই-বোনের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। ইসলাম মেয়ে এবং বোনের সঙ্গেও সদাচরণ করার তাগিদ দিয়েছে। আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারই তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করলে এবং তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে। (তিরমিজি, হাদিস: ১৯১২) বোনের লালন-পালনের প্রতি মনোযোগী ব্যক্তিকে আল্লাহ সংসারে অশেষ বরকত দেবেন। হাদিসে এসেছে, একবার জাবির (রাঃ) কে নবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কুমারী নারী বিয়ে না করে তালাকপ্রাপ্তা নারী বিয়ে করেছ কেন?' তিনি জবাব দেন, 'আমার বাবা মারা গেছেন। আমার ছোট ছোট কয়েকটি বোন আছে, তাদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যই আমি বয়স্ক নারী বিয়ে করেছি।' রাসুল (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।' (বুখারি ও মুসলিম)

ইতিহাসে ভাইয়ের প্রতি বোনের আন্তরিক ভালোবাসার অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হলো, একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এক নারীর স্বামী, সন্তান ও তার ভাইকে যুদ্ধবন্দি করে তার কাছে নিয়ে আসে। এরপর ওই নারীকে বলল, তুমি এই তিনজনের মধ্যে কোনো একজনকে মুক্ত করে নিতে পারো। তখন ওই নারী জবাবে বলেন, স্বামী তো আমার আছে। আর সন্তান আমার থেকে জন্ম হয়েছে। তবে ভাইকে আমি হারিয়ে ফেলেছি, তাই আমি ভাইকেই গ্রহণ করলাম। তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বললেন, তার এই সুন্দর বক্তব্যের জন্য আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম। (মুহাদারাতুল উদাবা : ১/৪৩৪)

তাই ভাইদের কর্তব্য বোনদের দায়িত্বের প্রতি সর্বদা সচেষ্ট হওয়া। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় বোনদেরর পাশে থাকা। বিশেষভাবে বাবার অপারগতা বা তার অবর্তমানে বোনের লালন-পালন, উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়াও ভাইয়ের দায়িত্ব। (বুখারি, হাদিস: ৫১৩০)

৫। নারী অনাত্মীয় হলেও সম্মানীয়

নারী অনাত্মীয় হলেও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের সৌন্দর্য। তার নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন থাকা সবার দায়িত্ব। ইসলামের ইতিহাসে নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় বনু কাইনুকা গোত্রের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এক সাহাবি তার মুসলিম বোনের সম্ভ্রম রক্ষায় জীবন দিয়েছেন।

আবু আওন থেকে ইবনে হিশাম বর্ননা করেছেন, একদিন জনৈকা মুসলিম নারী বনু কানুইকা গোত্রের বাজারে দুধ বিক্রি করে বিশেষ কোন প্রয়োজনে এক ইহুদি স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বসে পড়েন। কয়েকজন দুর্বৃত্ত ইহুদি তাঁর মুখের নেকাব খোলার অপচেষ্টা করে, ওই স্বর্ণকার মুসলিম নারীটির অগোচরে পরিহিত বস্ত্রের এক প্রান্ত তার পিঠের ওপরে গিঁট দিয়ে দেয়, তিনি তা বুঝতেই পারলেন না। ফলে তিনি উঠতে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। মহিলাটি ক্ষোভে ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন। তা শুনে জনৈক প্রতিবাদী মুসলিম ওই স্বর্ণকারকে আক্রমণ করেন। এর ফলে মুসলিম ও বনু কাইনুকার ইহুদিদের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত বাধে। (ইবনে হিসামঃ ২/৪৭)

৬। নারী শিশুদের প্রতি মর্যাদা

কোনো সফরে নারীরা অংশগ্রহণ করলে সবাইকে নবী (সাঃ) ধীরে ধীরে চলতে বলতেন। নারীদের আবেগ-অনুভূতির প্রতিও তিনি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। একবার তিনি তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ানো শেষ করে বললেন, '(মসজিদে) একটি বাচ্চা কাঁদছিল। আমার মনে হলো, ওর মায়ের মনে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। কাজেই, আমি তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করলাম, যাতে বাচ্চার মা তার বাচ্চার খবর নিতে পারে।' (বুখারি)

কন্যা শিশুর মর্যাদা ও সম্মান প্রদানে আল্লাহর রাসুল অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশু ফাতিমাকে অনেক ভালবাসতেন তিনি। তাইতো তিনি বলেন, 'শিশুদেরকে ভালোবাস, শিশুরা আল্লাহর পুষ্প। (তিরমিজি) মহান আল্লাহ বলেন 'তোমারা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করনা। তাদেরও তোমাদের রিযিক আমিই ব্যবস্থা করি।' (সূরা ইসরা ও সূরা আল ইমরান)

৭। বিধবাদের প্রতি মর্যাদা

বিধবাদের সাহায্যকারীদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিধবা ও মিসকীনের জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির সমতুল্য এবং যারা রাতে (নফল) ইবাদত করে ও দিনে সিয়াম রাখে তাদেরও সমতুল্য। (সহিহ বুখারী- ৫৩৫৩; সহিহ মুসলিম- ২৯৮২; নাসায়ী- ২৫৭৭; তিরমিজি ১৯৬৯; ইবনে মাজাহ- ২১৪০)

আউফ বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'আমি ও (নিজের যত্ন না নেওয়ায়) চেহারায় দাগ পড়া নারী পরকালে এভাবে থাকব অথবা শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুলের চেয়ে বেশি দূরত্ব থাকবে আমাদের মধ্যে। সে হলো সেই নারী, যার স্বামী মারা গেছে এবং তার বংশীয় মর্যাদা ও সৌন্দর্য থাকার পরও সে নিজেকে বিরত রাখে এতিম সন্তানদের জন্য যতক্ষণ না সন্তানরা (স্বাবলম্বী হয়ে) পৃথক হয়ে যায় অথবা মারা যায়।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৫২৪৯)

চাচা আবু তালেব মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে বলেন, 'তিনি শুভ্র, তার চেহারার অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হতো, তিনি এতিমদের খাবার পরিবেশনকারী আর বিধবাদের তত্ত্বাবধায়ক।'(সহিহ বুখারি, হাদিসঃ ১০০৮)

৮। দাসীদের প্রতি সম্মান

দাস-দাসী ও অধীনস্তদের প্রতি সুন্দর ও ন্যায়ানুগ ব্যবহার করতে শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। হযরত বারীরা (রাঃ), নামের এক দাসী ছিলেন। দাসত্ব অবস্থায় তার বিবাহ হয়। নবীজি (সাঃ) দাসত্ব অবস্থায় তাকে আজাদ করে দেন । তিনি আরও ইরশাদ করেন- তোমাদের দাসগণ তোমাদেরই দাস। সুতরাং তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খেতে দাও! তোমরা যেরূপ কাপড় পরিধান কর তাদেরকেও তদ্রূপ কাপড়ই পরিধান করতে দাও। (শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫)

৯। জ্ঞানার্জন বিষয়ে নারীদের প্রতি সম্মান

মহিলারা আপন মেধা, প্রতিভা, উদ্ভাবনীশক্তি, কর্মক্ষমতা ও সুযোগ মোতাবিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করবে ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকবে। হজরত খাদিজা (রাঃ) একজন বড় ব্যাবসায়ী ছিলেন। হজরত আয়িশা (রা.) ২২১০ টি হাদিস মুখস্থ ও বর্ননা করেছিলেন। তিনি কুরআনের তাফসীর করতেন। উম্মুল্‌মু'মিনদের সকলেই শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে অনেক মহিলা সাহাবী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। হযরত খানসা (রাঃ) একজন খ্যাতনামা মহিলা কবি ছিলেন। নবীজীর আদেশেই মহিলারা, কৃষি, শিল্প ও ব্যাবসায় অংশগ্রহন করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) হযরত হামনা বিনতে (রাঃ) সহ অনেকেই উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন।

নারী মুক্তির দিশারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকে শুধু মর্যাদা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি নারীকে যথাযথ অধিকার দিয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নারীকে তিনি অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, আইনগত এবং ধর্মীয় সব দিক দিয়ে তার অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তসমূহকে সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করা যায়:

- **ক.** নারীকে পিতার সম্পত্তিতে, স্বামী, সন্তান ও মায়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী ধার্য করা হয়েছে।
- **খ.** বিয়ের সময় নারীকে মোহরানা বা দেনমোহর প্রাপ্তি আবশ্যিক করেছেন এবং তা আদায় বা জোর করে ব্যয় করার অধিকার স্বামী, পিতা বা ভাই কাউকে দেওয়া হয় নি।
- **গ.** নারীকে স্বামী নির্বাচনের ও বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। একই সাথে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ২য় বিবাহের বা পুনঃবিবাহের অধিকার দেওয়া হয়েছে।
- **ঘ.** দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নি তিনি।
- **ঙ.** বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে নারীকে পুরুষের মতই সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।
- **চ.** অত্যাচার, অপমান, অশালীনতা ও অবমাননা থেকে নারীকে রক্ষার জন্যে মহানবী (সাঃ) জনসমক্ষে চলাফেরার সময় একটি অনুসরণীয় পোষাক-বিধি (Dress Code) মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

উপসংহার

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের আগে তৎকালীন বিশ্বে নারীর অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। নারীর সেই ঘোর দুর্দিনে নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান, অধিকার দিয়ে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলাম। মুহাম্মাদ (সাঃ) যে জীবনদর্শন, নারীর মর্যাদার রূপরেখা, মানবাধিকারের পরিধি ও সীমা নির্দিষ্ট করেছেন তা মহান আল্লাহ তা'আলারই অনুমোদিত জীবন বিধান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জীবন বিধান যা মানবাধিকারের প্রথম মৌলিক এবং পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা হিসাবে স্বীকৃত তা কেবল কোনো দলীল লিখিত নয়, কোনো স্বাক্ষরিত চুক্তি নয়, কোনো অনুকল্প নয় (hypothesis), বরং তা হচ্ছে কঠোর বাস্তবতা।

যখন নিদ্রামগ্ন আরবের বুকে অন্ধকারের রাজত্ব বিস্তার করছিল অর্থাৎ আইয়ামে জাহেলিয়াতের অজ্ঞানতার অন্ধকার, সে অন্ধকার থর থর করে কেঁপে উঠলো, অহংকার, হত্যা, জুয়া, ব্যভিচার আর মদ্যপানের উন্মত্ত তান্ডব আচমকা থেমে গিয়ে নতুন ঊষার এক স্বর্ণদ্বার উন্মোচিত হল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনে। নিজের শৈশব থেকে

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ৬৩ বছরের প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত রেখে নিজের জীবদ্দশাতেই একটি ধ্বংসস্তুপ থেকে, একটি পুঁতিগন্ধময় অন্ধকার আস্তাকুড় থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবিক মুল্যবোধকে তুলে এনে এক সুষম, অনুসরণযোগ্য, সার্বজনীন কল্যাণকর সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন – মানবাধিকার, মানুষের তথা নারীর মর্যাদা ও আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যই ছিল যার ভিত্তি।

মানবতার মুক্তিদূত নবীজি (সাঃ) এর জীবনে এই অর্জন, এই স্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য কল্যাণকর জীবন বিধান বিশ্বের অনেক গবেষক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। মাইকেল হার্ট 'দ্য হানড্রেড' গ্রন্থে একশ জন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম-বিন্যাস করেছেন। তালিকার প্রথমেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দ্বিধায় দাঁড় করিয়ে তিনি লিখেছেন: "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels."

.....